তারিখ 05 JUL 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

আজকের কাগজ

শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম

শহিদুল ইসলাম

শিক্ষা একটি পরিবর্তনশীল, সচল প্রপঞ্চ। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষানীতি কিংবা শিক্ষণীয় বিষয় সবই পরিবর্তন হয়। তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠার পর ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে কি বিষয় পড়ানো হত আর এখন কোন্ কোন্ বিষয় পড়ানো হয়। শিক্ষিত পাদ্রী সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে খ্রীষ্টধর্মের আইন-কানুন শিক্ষা দেয়াই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় দু'টির প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টধর্ম ও গীর্জার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের ঘোষণা ছাড়া ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অধিভুক্ত স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়া যেত না, আজ তা কেউ ভাবতেই পারে না। অবশ্য সেই সময় পৃথিবীর সর্বত্র ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া হত। কিন্তু কালের স্রোতে ক্রমপ্রসারমান গণতন্ত্রের ঢেউয়ে ঐসব মধ্যযুগীয় অগণতান্ত্রিক প্রপঞ্চগুলি ভেসে গেছে।

বাংলাদেশেই নয় শুধু, উপমহাদেশের মুসলিম এলিট ও শাসকবৃন্দ এই ধ্রুব সত্যটি বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। করলে, বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষাসূচীতে ধর্মশিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলিম শাসকদের কথা বলতে পারবো না। তবে অনুমান করা যায় যে, তাঁরাও পরিবর্তিত সমাজ বাস্তবতাকে তাঁদের শিক্ষা চিন্তায় স্থান দেন না এবং সময়ের প্রয়োজনে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেন না। করলে, বর্তমান বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারে মুসলমানরা নিশ্চয়ই কিছু অবদান রাখতে পারতো।

অনেকে নৈতিক শিক্ষার জন্যে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। আমার মনে হয় বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর সবদেশেই সকল পরিবার তাদের সন্তানদের স্ব স্ব ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। আমাদের দেশেও বাড়িতে বাড়িতে ধর্মশিক্ষা দেয়ার রেওয়াজ উঠে যায়নি। আমার মনে হয় পরিবারই ধর্মশিক্ষার উপযুক্ত স্থান। পিতামাতা তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী সন্তানদের স্ব স্ব ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা দেবেন। সমকালীন সাহিত্য দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, কেবল ধর্মীয় সাহিত্যে সমৃদ্ধ ও ধর্মান্ধ আলেম সমাজের কাছে সন্তানদের প্রেরণ করে অনেকেই স্বস্তিবোধ করেন না। আমাদের দেশ সম্প্রতি ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে গ্রহণ করে 'ধর্মরাজ্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই প্রতিদিন রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সরকার দেশবাসীকে 'খাঁটি' মুসলমান বানানোর প্রক্রিয়া চালু করেছেন। ভারতের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট দেলোয়ার হোসেন, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার, এম, আজিজুল হক প্রমুখ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম মনীষীবৃন্দ আজ থেকে প্রায় একশ'-সোয়াশ' বছর আগে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করেছিলেন। বিশ শতকের শেষ দশকে, যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া একান্ত জরুরী ছিল, তখন সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটিয়েছেন এবং আধুনিক শিক্ষাক্রমে ধর্মশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে যুগবিরোধী শিক্ষা কার্যক্রম দেশবাসীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। পরিবারে ও সমাজে, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র একই সঙ্গে এভাবে নৈতিক শিক্ষার নামে প্রমাণাতীত ধর্মীয় সিদ্ধান্ত 'স্বতঃসিদ্ধ সত্য' বলে শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে শিশুর মনকে বিজ্ঞান বিমুখ করে তোলা হচ্ছে। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি মতামত স্মরণযোগ্য। তিনি স্কুলের পাঠ্যসূচীতে বার্কলের 'ইনকোয়ারি' গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করেছিলেন। তার যুক্তি ছিল যে 'ইনকোয়ারির' সঙ্গে সাংখ্য ও বেদান্তের আশ্চর্য মিল আছে। সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন হলেও হিন্দুদের এর প্রতি অপরিসীম দুর্বলতা আছে। তাই একজন ইংরেজ দার্শনিকের লেখার সঙ্গে মিল খুঁজে পেলে তাদের সেই ভ্রান্ত দর্শনের প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ় হবে। তাহলে ক্ষতি কি হত? এই হত যে, তাদের মনে বিজ্ঞানের আলো পৌঁছানো শক্ত হয়ে উঠতো। তাই পরিবারের চৌহদ্দিতে প্রমাণ-অপ্রমাণ-নিরপেক্ষ ধর্মীয় সিদ্ধান্তগুলি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রমাণযোগ্য বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে এই দুই বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের একটা সুযোগ ছিল। বাংলাদেশে সে সম্ভাবনাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে এবং আধুনিক শিক্ষাসূচীতে ধর্মশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে, মানুষের নৈতিক মান বৃদ্ধি পেয়েছে, সে কথা কেউই স্বীকার করবেন না। বরং উল্টোটিই সত্যি। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, হত্যা-লুণ্ঠন, চোরাচালান, রাষ্ট্রের অর্থ-আত্মসাৎসহ সব রকমের অপকর্মের বিস্তৃতি ও সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য ধর্ম-শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আজ সারাদেশ নিন্দায় ও ঘৃণায় সোচ্চার। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, যেখানেই সন্ত্রাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে একপক্ষ ইসলামের স্লোগান মুখে নিয়ে বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য উপস্থিত। পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা মাদ্রাসার চার দেয়ালের মধ্যেও সমানভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রতিবছর বিভিন্ন মাদ্রাসার বাথরুমের নোংরার মধ্যে থেকে বস্তা বস্তা কোরান হাদিসের পৃষ্ঠা উদ্ধারের খবর প্রায়ই খবরের কাগজে ছাপা হয়। এটা মাদ্রাসার ছাত্রদের নৈতিক মানেরই পরিচয় নয় শুধু, ইসলামের প্রতিও তাদের মনোভাবেরও বহিঃপ্রকাশ। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, ধর্ম যদি মানুষের চরিত্রগঠনে সহায়ক হয়, তাহলে বাংলাদেশে আজ সামগ্রিক নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি হবে কেন? এ সন্দেহ আমাদের দেশের অশিক্ষিত-ধর্মভীরু মানুষের সরল ধর্ম বিশ্বাসকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। কারণ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকারীরা তাদের প্রচারণায় সবসময় নিজেদের ইসলামের সমার্থক হিসেবে জনসম্মুখে উপস্থিত করে। ফলে ক্ষতি হয় ধর্মেরই।

তাছাড়া নৈতিকতার মানদন্ড ও সমাজ নিরপেক্ষ নয়। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার মানদন্ডও বদলে যায়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এক সময় ঈশ্বরের নির্দেশের নামে যা দিয়ে নৈতিকতার মানদন্ড তৈরি করা হত, আজ সেগুলির অনেক কিছুই শুধু হাস্যকরই নয়, অমানবিক ও অনৈতিক মনে হয়। ক্রীতদাস প্রথাকে এক সময় ধর্মের মোড়কে ঈশ্বর প্রদত্ত একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে বিশ্বাস তৈরি করা হয়েছিল। পরে সামন্ত প্রথাকেও ঈশ্বর-অনুমোদিত প্রথা হিসেবে সমর্থন জানাতে ধর্মবেত্তাগণ ইতস্তত করেনি। আজ যেমন সব ধর্মই পুঁজিবাদের সমর্থক। বলাই বাহুল্য এসব শোষণমূলক অর্থনৈতিক কাঠামো সমর্থন করে ধর্ম তার আদিরূপ থেকে সরে এসেছে।

ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের এই যুক্তি নির্মাণে সহায়তা করে যে পাঁচ হাজার বছর আগের মানুষের ধর্ম বিশ্বাস অটুট রাখতে হলে, আমাদের সেই সমাজেই ফিরে যেতে হবে। সভ্যতার আলো সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনগুলি সম্পূর্ণভাবে মানুষের বুদ্ধির অগোচরে রাখতে হবে। মানুষকে তখনকার মতই প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল রাখতে হবে। এটা কি সম্ভব? মূর্খতা ও অজ্ঞানতার সম্প্রসারণ যদি মানুষের 'খাঁটি' ধর্ম বিশ্বাস অটুট রাখার মূলমন্ত্র হয়ে থাকে, তাহলে কি সেটা কাম্য? জানি, তাহলে ধর্ম-সৃষ্ট নৈতিকতার শক্ত দড়িতে আগের মত মানুষের চেতনাকে কঠিনভাবে বেঁধে রাখা যাবে। তাই বোধহয় মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।"[২] একই কথা বার্ট্রান্ড রাসেলের মুখে শোনা যায়। "If any morality is better than none, then religion has been a force for good."[৩] অনেকটা 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'র মত। মানুষ যত শিক্ষিত হয়, সংস্কৃতিবান হয়, রুচিশীল হয়, তার নৈতিক চরিত্র গঠনে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। সামাজিক প্রয়োজনানুযায়ী সাম্প্রতিকতম জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ তখন নৈতিকতা নির্মাণে স্বনির্ভরতা অর্জন করে।

ধর্ম একটি জটিল সামাজিক প্রপঞ্চ। এর যেমন একটি